একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU
ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

# 'Midnight Biography' and the 'Nabakumar' of 21st Century: The Search for Another World

# 'মধ্যরাত্রির জীবনী' এবং একবিংশ শতাব্দীর নবকুমার: অন্যতর ভুবনের সন্ধান

Name of the Author: **Dr. Siddheswar Banerjee**
Affiliation: **Assistant Professor, Bengali Department**
**Chittaranjan College, Kolkata**
**West Bengal, India**

**Abstract:** Rabisankar Bal always tried to concentrate in his fiction writing with the multilinear aspects of life and reality. Never he was confined by any '-ism', as our intense observation. Many critics like to categorize him as Magic Realistic Writer. But, in thorough reading it is revealed that in his fictions always there are many dimensions of life, as well as philosophy. We shall proceed and justify these mainly by thorough analysis of his exceptional 'Novel' "Madhyaratrir Jiboni", which was published first in 2002. Nabakumar, Jyotiprokash and Rajat always tried to reach their goal. Nabakumar wished to be a famous chess-palyer, alike renowoned chess grandmaster Anatoly Yevgenyevich Karpov. Jyotiprakas struggled to be a novelist. Rajat, as a communist, thought 'Revolution' would come and the scenario of the country will be changed. But, after a certain time, Rajat observed that Nabakumar and Jyotiprakash are totally failure, their dreams are far from reality. Not only that, Rajat, himself become changed, now he is so called 'Social'; in him there is no fire for revolution. 'What to do with Life?' – This thought of Bankimchandra Chattopadhyay in his novel 'Kapalkundala' becomes the prevailing sentence of the novel 'Madhyaratrir Jiboni'. The failures of the middle-class men, the hopeleness, disorientation and lastly mental disballance are the fate or reality – Novelist Rabisankar Bal has tried to conclude like this.

**Keywords:** Madhyaratrir Jiboni, Nabakumar, Rabisankar Bal, Other World, Mental Imbalance

# ‘মধ্যরাত্রির জীবনী’ এবং একবিংশ শতাব্দীর নবকুমার: অন্যতর ভুবনের সন্ধান

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী

রবিশংকর বল প্রচলিত লোকপ্রিয় আখ্যান রচনার সোজাপথে কখনই হাঁটার চেষ্টা করেননি। তাঁর সাহিত্যসৃজনের আদ্যোপান্তে ক্রিয়াশীল থেকেছে ব্যতিক্রমী চিন্তাচেতনার ঝলক। তিনি একদিকে যেমন সময়ের স্বর শুনতে চেয়েছেন একাগ্র নিবিষ্টতায় তেমনই সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিতে পারা মানুষের হৃদয়ার্তি তাঁকে বারেবারে বিব্রত করেছে। পাশাপাশি ‘এই জীবন লইয়া কী করিতে হয়?’[১] – এই প্রশ্ন তাঁর আখ্যানের এক ক্রম-বিবর্তনিক বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যাজিক রিয়ালিজম ধারার অন্যতম কথাকার হিসেবে বেশিরভাগ সমালোচক তাঁকে শ্রেণিবদ্ধ করে দিয়ে তৃপ্তিবোধ করেন। কিন্তু নিবিড় পাঠে উপলব্ধি করা যায় শুধু ম্যাজিক রিয়ালিজমের অতিবাস্তবিক মায়ালোকেই রবিশংকর বলের অবস্থান নয়, তার বাইরে গিয়েও ভিন্ন ভুবনের সন্ধান তিনি করে গেছেন। আমরা মূলত তার অন্যতম ব্যতিক্রমী উপন্যাস ‘মধ্যরাত্রির জীবনী’ সাপেক্ষে তাঁর উপন্যাসিক সত্তার বিশেষত্ব অন্বেষণ করার চেষ্টা করবো। একইসঙ্গে জীবন দর্শনের নানা মাত্রা কীভাবে উপন্যাসে উঠে এসেছে, কীভাবে পূর্বজ কবি সাহিত্যিকদের সৃজনকে তিনি ব্যবহার করেছেন অপরিসীম সংশ্লেষণী মুন্সিয়ানায় তা বিবেচনার আওতায় থাকবে। বিবেচনার আওতায় থাকবে তাঁর উপন্যাসে কীভাবে নির্দ্বিধায় অভিব্যক্ত হয়েছে ক্ষুধা ও যৌনতার নগ্ন রূপ ও ভাষ্য।

**দুই...**

আর পাঁচজন কথাকারের মতো খুবই স্বাভাবিকভাবে রবিশংকর সময়ের দাবিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। সময়ের উত্তাপ তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই অগ্রাধিকার পেয়েছে।তবে তাঁর আখ্যানের সময় কখনই খণ্ডিত কালের ব-দ্বীপে আটকে থাকেনি। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চলাচলে তাঁর বেশিরভাগ আখ্যানই আন্দোলিত, ক্ষেত্রবিশেষে এলোমেলো হয়ে গেছে। আমাদের আলোচ্য ‘মধ্যরাত্রির জীবনী’ উপন্যাসের শুরুই হচ্ছে সময়ের প্রতি অন্যতম প্রধান চরিত্রের তির্যক বাক্যের মধ্যে দিয়ে:

> “সময় তোমার সামনে টিক্ টিক্ এগিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি শুয়ে বা বসে আছো, একা একা দাবার ঘুঁটি সাজাচ্ছো, ভাঙছো, আবার সাজাচ্ছো – মানুষ এভাবে বাঁচতে পারে নাকি?”[২]

সময়হীনতাকে ভালো ভাবতে চেয়েছ নবকুমার; কিন্তু সত্যিই চেয়েছে কি? আদতে ভাবতে বাধ্য হয়েছে – বাধ্য করেছে তার পরিস্থিতি, তার সাংসারিক বাস্তবতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের রুদ্ধ শাসানি। বহির্জগতে সে কর্মের পরিসর খুঁজে পায়নি, পাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তাই - “এই বিছানাই যেন তার মাতৃগর্ভ।”[৩] বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা না পাওয়া, ঘরের পরিবেশে অস্থিরতার সাপেক্ষে ঘুম তার কাছে যেন মুক্তির রাস্তা, স্বপ্ন যেন অতি-বাস্তব। তাই কাহিনি কথক জানান: “কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তব সে আজ আর আলাদা

করতে পারে না। নবকুমারের শুধু মনে হয়, সে একের পর এক ঘুমের টানেল পেরিয়ে চলেছে।"[৪] এই ধন্দের মধ্যে দিয়েই তার জীবন বয়ে চলে।

দিনের পর দিন তাকে শারীরিকভাবে ব্যবহার করে চলে তন্ত্রসাধক তারাপ্রসন্ন। সব বুঝেও নবকুমারের কিছু করার থাকে না। "তারপর তাকে উপুড় করে ফেলে তার পায়ুদ্বারে তারাপ্রসন্ন ঢুকিয়ে দেবে আগুনের রড ... তারাপ্রসন্নর শক্তিসাধনা..."[৫]। শুধু তাই নয়, তারাপ্রসন্নর সাধনসঙ্গিনী (আসলে, ভাড়া খাটানো নারী) সুরবৌদিও তাকে ব্যবহার করে যথেচ্ছভাবে। "তারাদার আনা খদ্দেরদের ইচ্ছেমতো বিছানায় সুরবৌদিকে সব কিছু করতে হয়। আর সুরবৌদি নিজের আকাঙ্ক্ষার জন্য বেছে নিয়েছে তাকে।"[৬] এহেন জীবন থেকে উত্তরণের রাস্তা খোঁজে নবকুমার। রজতের সঙ্গে মাঝে মাঝে শলা পরামর্শ করে। ব্যবসা করার পরিকল্পনা জানায়। কিন্তু মূলধন তো তার নেই। তাই আঁধার আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

গত্যন্তর না দেখে একসময় নবকুমার সুরবৌদির সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আশ্রয় নেয় মুর্শিদাবাদের দিকে একটি গ্রামে। কালোবাজারের ঠিকেদার শ্রীপদ পুরকাইতের তৈরি মন্দিরের আটশ টাকা মাস মাইনের কাজে যোগ দেয়। 'জীবন্ত দেবী' সুরসুন্দরীর জন্য পান সাজা, দোকান থেকে এটা ওটা নিয়ে আসা, তেল মালিশ করা আর রাতের বেলা তার খেলার পুতুল হওয়া – এই হয়ে ওঠে নবকুমারের মুক্তির দেশের কাজ। কিন্তু সেই নড়বড়ে আশ্রয়, সেখান থেকেও মুক্তি পেতে চেয়েছিল নবকুমার। অবশ্য সুরসুন্দরীই তাকে মুক্তি দিয়ে না-ফেরার দেশে পাড়ি জমায়। বংশগত পাগলামির বীজ তো ছিলই; জীবনের নানান বঞ্চনা, শেষ অব্দি সুরসুন্দরীর আত্মহত্যা নবকুমারকে সামাজিকতার সব দরজা থেকে বিদায় জানাতে বাধ্য করলো। অগ্রজ রূপকুমার ও অরণিকুমারের দেখানো পথে সেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলো।

**তিন...**

জ্যোতিপ্রকাশ 'মধ্যরাত্রির জীবনী' উপন্যাসের অন্যতম, বা বলা ভালো প্রধান চরিত্র। অবশ্য প্রথাগত চরিত্রের ভিড়ে কাহিনিকে সমর্পণ করতে চাননি কথাকার। কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশের জীবনের আয়নাতেই কাহিনির সামগ্রিক রূপ দেখা যেতে পারে। কে এই জ্যোতিপ্রকাশ? লেখক হতে চেয়েছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ। কিন্তু সাতষট্টি বছর জীবন অতিবাহনের পর সবকিছুই তার কাছে কেমন যেন অর্থহীন মনে হয়। এত বছরের জীবনে তার সঞ্চয় কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি যেন দিশেহারা, ছিন্নভিন্ন হয়ে যান:

> "... বলার মত কিছু আছে কি? একটা ভাঙাচোরা সংসার, আজ যাকে আর সংসার নয়, সরাইখানা বলা যায়, দুটি পাগল ছেলে, একটি ভেটারেন গুন্ডা ও একজন বেকার। আর উমা তো তিনবছর আগেই টাটা-বাইবাই জানিয়ে চলে গেছে। জ্যোতিপ্রকাশ জানে, আরও অনেকদিন তাকে বেঁচে থাকতে হবে, সঞ্জয়ের মত, এই মহাভারতপর্বের দ্রষ্টা হিসেবে।"[৭]

এই ব্যক্তিক ট্র্যাজেডি শুধু জ্যোতিপ্রকাশের নয়। মধ্যবিত্ত মানুষদের অনেকেরই জীবনের এই অনিবার্য পরিণাম। চাওয়া-পাওয়ার ব্যালান্স সিট এলোমেলো হয়েই থাকে, সেভাবেই শেষ হয়ে যায় জীবনের খাতা। এজন্যই হয়তো: "একদা লেখক হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জ্যোতিপ্রকাশকে তাই আজ আর স্পর্শ করে না।"[৮]

অথচ এই জ্যোতিপ্রকাশ কলমের কারবারি হতে চেয়েছিল। যতই আত্মকথনে উঠে আসুক: "কী পরিচয় চেয়েছিলে তুমি, জ্যোতিপ্রকাশ? কিচ্ছু না, একজন মানুষের কাছে সত্য হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম!"[৯] আদতে হয়ে উঠতে না পারার যন্ত্রনা প্রতি মুহূর্তে তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। সামাজিকভাবে 'মেম' হিসেবে অপমানজনক পরিচয় আর আত্মগতভাবে লেখক না হয়ে উঠতে পারার পরিচয়হীনতা – এরই যাঁতাকলে তার ব্যক্তিত্ব বেসামাল হয়ে পড়েছে; যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত পুত্রদের মধ্যে দেখা যায়। তাঁর কোনও পুত্রই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে দেখা যায় অস্বাভাবিকত্ব, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পাগলামি। যথা:

- "অরণিকুমার ঘুমের ভিতরে হাঁটে। কোথায় যে চলে যেতে চায়। শুধু হাঁটা নয়, ঘুমের ভিতরে কথা বলতেও শুরু করল অরণিকুমার। কার সঙ্গে কথা বলে সে?"[১০]

আর এক ছেলে নামে বিপ্লবী, বাস্তবিক গুন্ডা। শেষ অব্দি বিভিন্নভাবে প্রতারিত। নবকুমার অপ্রকৃতিস্থ। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে স্বাভাবিক ভাবেই জ্যোতিপ্রকাশের মনে হয় – জীবনের নিরন্তর চাহিদায় অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। তাই হয়ে পড়েন নস্টালজিক:

"বাড়ি শুধু থাকার জায়গা নয়। বাড়িরও একটা জীবন থাকে। বাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িও বড় হয়, বেঁচে থাকে, কত পায়ের শব্দ, হাসি-কান্না, দেওয়ালে কোনো শিশুর হাতে আঁকা ছবি সে ধরে রাখে।"[১১]

কিন্তু এতশত দার্শনিক বোধ, জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতার কীই বা দাম? কে দাম দেবে? কার কাছে কতটকুই বা গুরুত্ব? এবম্বিধ চিন্তাতরঙ্গে উদ্বেল হয়ে পড়েন প্রায়শই: "নিজের মুখোমুখি বসে এভাবে লেখার কোনো মানে আছে? মানুষের জীবনের এইসব অতি সাধারণ ঘটনার কথা কে জানতে চায়? মানুষ আজ বড় বড় বিস্ময়ের পিছনে ছুটছে। কেউ বাড়ি-গাড়ি-ভবিষ্যত নিরাপত্তা, কেউ বা সমাজ সময়-ইতিহাস। ঘরের কোণে বসে যে-মানুষটা কাঁদে, তার মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই আমাদের। আধুনিকতার মোহ আমাদের ছিবড়ে করে দিয়েছে।"[১২] এইসব তাত্ত্বিক টানাপোড়েন তাঁকে চিন্তার দিক থেকে মাঝেমাঝেই দেওলিয়া করে তুলেছে। কিন্তু জীবনের গরল পান করে তিনি হয়ে উঠতে চেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়। তাই "মৃত্যু কি এভাবেই হেঁয়ালি করে!"[১৩] – এই প্রশ্ন বেশি সময় মাথাচাড়া দিয়ে থাকতে পারে না। কখনও তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের উদার তত্ত্বে পৌঁছে যান, কখনও বা পৌঁছে যান জীবনানন্দীয় অতীন্দ্রিয় জগতে।

**চার...**

'মধ্যরাত্রির জীবনী' উপন্যাসের খুবই আকর্ষণীয় চরিত্র 'সাহেব', জ্যোতিপ্রকাশের স্ত্রী, উমা। যে উমার সৌন্দর্য জ্যোতিপ্রকাশের চোখে ভয়ংকর ঠেকেছিল, নিশির ডাকের মতো মনে হয়েছিল, সেই উমা সমাজের কাছে হয়ে উঠেছিল পুরুষালি, তাই প্রতিবেশীরা তাকে সাহেব বলতো। জীবনের উপান্তে এসে সেই দাপুটে উমা কী পেয়েছিল? এর উত্তর জ্যোতিপ্রকাশ জানতে চাইলে উমা হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে। জ্যোতিপ্রকাশের মনে হয়, "ওর কান্নার সঙ্গে একটা শতাব্দী যেন ভেঙে পড়ছিল।"[১৪]

আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় অনেক সময়েই মহিলারা পুরুষালি হতে গিয়ে নিজের জীবনকে উপভোগ করতেই পারে না। নিজের জীবনকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করার পরিবর্তে দাপট, মিথ্যা চমক, লোক-দেখানো বাহুল্য নিয়েই মেতে থাকে। উপলব্ধির সময় যখন আসে, তখন বড্ড বেশি দেরি হয়ে যায়।

সুরসুন্দরীর বাস্তবতাও অনেকটা এরকম। যে ছিল রমা, তারাপ্রসন্নের চক্করে পড়ে সুরসুন্দরী হতে গিয়ে, যোগিনীর বেশে আসলে হয়ে ওঠে বেশ্যা, বারবনিতা। কিন্তু ক্রমে যেন সেই জীবনকেই তার সত্য বলে মনে হতে থাকে, মনে হতে থাকে দারুণ উপভোগ্য, পক্ষান্তরে সামাজিক অবিচারের যোগ্য জবাব। এজন্যই হয়তো একসময় নবকুমারকে সে বলে: "তোমরা পুরুষরা হাজার মেয়ের স্বাদ চাইতে পারো – সেসব নিয়ে কথা বলতে পারো – আর আমি বললেই দোষ? আমার ভালো লাগলেই আমি বারোভাতারি?"[১৫] আসলে প্রেমের প্রতি, ভালোবাসার প্রতি তার বিশ্বাস উড়ে যায়। বেদনাদীর্ণ হৃদয় উপলব্ধি করে: "তোমরা কাকে ভালোবাসা বলো আমি জানি। সুন্দর সুন্দর সব সাজানো কথা। ... সব ওই কাপড় তোলার ফিকির গো। ওসব আমি জানি।"[১৬] বিশ্বাস চলে গেলে মানুষের জীবনে কিই বা আর অবশিষ্ট থাকে? সেই হতাশার জায়গা থেকে, সেই বঞ্চনার অনিবার্য উপদ্রব থেকে জীবনের প্রতিও বিশ্বাস উবে যায় সুরসুন্দরীর। নবকুমারের মনে হয়: "অথচ কত লোভ ছিল তার। টাকার লোভ, গয়নার লোভ, শরীরের স্বাদের লোভ। এমন নগ্নতা নিয়ে সে কীভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারল?"[১৭] কিন্তু আমরা পাঠকেরা উপলব্ধি করতে পারি এই নিঃসঙ্গতার, এই প্রেমহীনতার অনিবার্য পরিণাম।

প্রেমহীনতার বলি হয় আরও একটি চরিত্র। নবকুমারের লক্ষ্মীদি। কালীসাধক সত্যেন জেঠুর সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে। এপিলেপটিক ফিটের আকস্মিকতায় জলে ডুবে মারা যায়। এই মানসিক ও স্নায়বিক রোগের পিছনে মুখ্যত ক্রিয়াশীল ছিল প্রেমহীনতার ভয়। "একটাই ভয় ছিল লক্ষ্মীদির, যা পাড়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে বলত। বোনেরা নাকি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। কেননা, বাবা তাকেই সবচেয়ে ভালোবাসে।"[১৮] সত্যেন বাবুর ক্যান্সারে মৃত্যুর পর লক্ষ্মীদি আসলে জীবনের মূল অবলম্বন হারিয়ে ফেলে। ফলে জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

**পাঁচ...**

তত্ত্বের পথে কি জীবন চলে? মানুষ কি তত্ত্বের সারবত্তা অনুধাবন করে জীবনকে নির্মাণ করতে চায়? মানুষ আদৌ কি আঁকড়ে বাঁচতে চায় পুরনো মূল্যবোধ, সনাতন ভাবাদর্শ, কালবাহিত সংস্কার? এইসব নানান প্রশ্নের জটাজালে 'মধ্যরাত্রির জীবনী' উপন্যাসের চরিত্রগুলি, বিশেষত নবকুমার, জ্যোতিপ্রকাশ ও রজত ঘুরপাক খায়। উত্তরণ আছে কি? নাকি নেহাত ফিরে ফিরে আসা ব্যর্থতার নামাবলি গায়ে নিয়ে?

জীবনকে তত্ত্বচালিত করতে চেয়েছিল রজত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হয়ে ওঠে ছাপোষা সাধারণ এক মধ্যবিত্ত। তাঁর দর্শন উদ্ভট আপাতভাবে মনে হলেও আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়:

- "মাঝে মাঝে এক একটি পাঁঠার মুখে সে পরিচিত কারুর মুখের আদল দেখতে পায়।"[১৯]

- “অনেক সময় তার মনে হয়, যেমন এখন, কবেকার জং ধরা জালগুলি যেন তার গায়ে কেটে বসছে।”[২০]
- “রজত আজ বোঝে, অন্য কাউকে আক্রমণ করেই মানুষ এইসব ইলিউশন বজায় রাখতে চায়। বিপ্লবের আগ্রাসী ইলিউশন।”[২১]
- “আজ এতদিন পরে নবকুমারের সেই দৃষ্টি দেখতে পায় রজত। বলির পাঁঠার মতো।”[২২]
- “রজত আজ বোঝে, পৃথিবীর সব নিরুপম কাহিনিগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মজৈবনিক।”[২৩]

রজতের মতো নবকুমারও জীবনকে নানাভাবে দেখে। উপলব্ধি করে। নব নব দর্শনে পৌঁছোয়। এইসব দর্শনের খুব যে সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন নয়; কিন্তু শ্রেণিবিশেষের সমাজ বাস্তবতায় ধ্রুবসত্য বলেই মনে হয়। জীবনকে কখনও কখনও তাঁর মনে হয় পশ্বাতর বা অস্তিত্বহীন।

- “শালা কুত্তার বাচ্চা! নবকুমার এলোপাথারি দুজনের উপর লাঠি চালায়। এভাবে লাঠি চালাতে গিয়ে, খোঁয়াড়ির ভিতরে সেও কুকুরের মত জিভ বার করে হাঁফাতে থাকে।”[২৪]
- “অথচ ভূতেরা তো সাধারণত পরিচিতই হয়!”[২৫]

আলোচ্য উপন্যাসে দর্শক ও পর্যবেক্ষক রজত; আর যাকে ঘিরে তার দর্শন সে হল নবকুমার। আসলে আমাদের মনে হয় উপন্যাসিকেরই প্রতিভূ রজত, যে অনেকাংশে নবকুমারের যাপিত জীবনের অংশীদার এবং সমযাত্রার পথিক। তাই নবকুমারকে সে বুঝতে পারে আবার কখনও কখনও পারেও না। আসলে তার মনে নিরন্তর চলে আদর্শ ও বাস্তবতার লড়াই। নবকুমার যেমন অনুভব করে, “এক একদিন দুপুরে ঘুম ভেঙে সে জেগে ওঠে, ঘুমের ভিতরে সে অনুভব করে, বুকের ভিতরে বালি ঝরছে। সর্, সর্, ঝর্, ঝর্। কী হিম সেই আওয়াজ।”[২৬] তেমনই রজতেরও মাঝে মাঝে মনে হয়: “বস্তুতপক্ষে তখন নবকুমারদের বাড়িকে তার আলিবাবা আবিষ্কৃত গুহা বলেই মনে হত।”[২৭] ব্যক্তিগত স্তরে যেমন তার ইচ্ছে জাগে সমাজ বিপ্লবের অগ্রণী দূত হবে। কিন্তু নবকুমার রজতের এই ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলে। তার মনে হয়: “ওরা নাকি নকশালবাড়ির ধারায় আবার লড়াই শুরু করবে। তাহলে রজত সারাদিন বসে বসে তার সঙ্গে দাবা খেলে কেন?”[২৮] নিজের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়েও এই একই আশা-হতাশার দ্বন্দ্ববোধ কাজ করে এযুগের নবকুমারের:

- “একসময় তার মনে হল দাবারু হওয়াই ভবিতব্য। কেন যে! তারপর কারপোভ হওয়া তার উচ্চাশা হয়ে দাঁড়াল।”[২৯]
- “এক একদিন স্বপ্নে নিজের মৃতদেহ দেখে ঘামতে ঘামতে জেগে ওঠে নবকুমার।”[৩০]
- “এখন সব খণ্ড খণ্ড দেখে নবকুমার। যেন বাহান্ন পীঠে ছড়ানো আলাদা, ছিন্ন এক একটি অঙ্গ। ওই তো সুরসুন্দরীর বাহু। ওই তার কোমর ও নিতম্বের মধ্যবর্তী ঢল। ঠাসা ময়দার তালের মতো বুক।”[৩১]
- “এই বেশ্যাবৃত্তির চেয়ে তার পাগলাগারদ ভালো।”[৩২]

রজত নবকুমারকে তার বাবার চোখ দিয়েও বুঝতে চায়। এই বোঝাবুঝির সূত্রেই উপন্যাসিকের অভিপ্রায় বিধৃত হয়ে পড়ে। নবকুমারের এই কাহিনি কি উপন্যাস? প্রচলিত আখ্যান? সেই সম্পর্কে কথাকার মাঝে মাঝেই কাহিনির মধ্যে ঢুকে পড়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন:

- "শিল্পের মোড়ক যেখানে ফেঁসে যায়, জীবন সেখানে আরও একটু নগ্ন হতে পারে।
  আমি এই লেখায় এই নগ্নতাকেই ছুঁতে চেয়েছি। যতদূর ওই আকারহীন নমস্য জলরাশির কাছে যাওয়া যায়। তাই এটি হয়তো উপন্যাস নয়, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা কিছুই নয়।"[৩৩]
- "আমি পাগলদের নিয়ে একটি উপন্যাস লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শূন্য করোটির ভিতরে যেসব দৃশ্যাবলীর চলাচল, আমরা তা দেখতে পাই না। আমরা সাজানো-গোছানো ভাষার মানুষরা সেই করোটির নৈঃশব্দকে ছুঁতে পারি না।"[৩৪]
- "ধ্বংস হোক উপন্যাসের নামে মধ্যবিত্ত সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যান।"[৩৫]
- "এ-মুহূর্তে যাঁরা উপন্যাসটি পড়ছেন, তাঁরা মাপ করবেন, অনেক চেষ্টা করেও আমি একটি নিটোল কাহিনি তৈরি করতে পারছি না। কিছুতেই পারি না আমি।"[৩৬]

কেন মানুষ পাগল হয়, আসল সৌন্দর্য কী, কোন পথে মানুষের এগোনো উচিত এইসব নানা তাত্ত্বিক পরিসর নবকুমারের জীবনের পরিপার্শ্বে আবর্তিত হয়। কখনও রজতের ভাবনায়, কখনও জ্যোতিপ্রকাশের ভাবনায়। আর সেইসব ভাবনায় আন্দোলিত হতে দেখা যায় নবকুমারকে। রবীন্দ্র দর্শনের অনুষঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে কখনও সখনও:

- "যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি – সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে।"[৩৭]

জ্যোতিপ্রকাশের এই ভাবনা "মানুষ কি তাহলে মানুষের নিগ্রহ দেখতে ভালোবাসে? মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে, ততই নিজেকে জাস্টিফাই করার যুক্তি হাতে এসে যাচ্ছে। কী প্রয়োজন ছিল এত জ্ঞানের? আমরা কেউ আর কারুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। জ্ঞান মানুষকে ঠাণ্ডা মাথার খুনি করে তুলছে।"[৩৮] ক্ষেত্রবিশেষে নবকুমারেরও দর্শন হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের বীভৎস অভিজ্ঞতা নবকুমারকে অস্বাভাবিক করে তোলে। একসময় রজতকে সে বলে: "একদিন কী দেখলাম জানিস... আমার চোখ দুটো নেই, দুটো গর্ত আর সেখান থেকে বিজ বিজ করে কালো পোকা বেরুচ্ছে, বাইরে এসেই পোকাগুলো বেলুনের মতো ফুলতে ফুলতে বড়ো হয়ে যাচ্ছে ... তোর বিশ্বাস হচ্ছে না, না?"[৩৯] নবকুমারের এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা শুনতে শুনতে রজতের কখনও কখনও মনে হয়: "নবকুমারের জীবনকাহিনী যেন ওই একাকী মসজিদটির মতো, শুধু চার ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া তা এক পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ।"[৪০] জ্যোতিপ্রকাশের কাছে রজত জীবনের বহু পাঠ পেয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম এক পাঠ রজতের প্রায়ই খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। উদ্দেশ্যহীন জীবনের সেই নিরাশাবাদী পাঠ হৃদয়ে প্রায়ই নাড়া দেয়: "আসলে জানো, জীবনের গতিপ্রকৃতি কিছু বোঝা যায় না। মানুষ যে কী চায়, তাও বোঝা যায় না। অথচ সেই না-বোঝা চাওয়া তাকে ছুটিয়ে মারে। শুধু মনে হয়, কী যেন সে পায়নি। আর

এই বোধ, জীবনকে কেমন বিস্বাদ করে দেয়। কোনও কিছুতে আগ্রহ থাকে না তখন। দিনের পর দিন ঘুমের ভিতরে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।"[৪১]

এই যে মরীচিকার পিছনে নিরন্তর ছুটে চলা তা তো একসময় থামবেই। যেমন মেমের থেমে গেছে, যেমন সুরসুন্দরীর থেমে গেছে। তাই মনে হয়, আমাদের নিজের কাছে ফেরার একটা রাস্তা জানা দরকার। সেই ফেরার রাস্তা কি আত্মহত্যা না আত্মআবিষ্কার? এই দ্বন্দ্বেও নবকুমার উৎপীড়িত।

- "উন্মাদনার মতো আত্মহত্যার মুহূর্তও ভাষাহীন। আমরা, ভাষা পৃথিবীর মানুষরা তাকে ছুঁতে পারি না। আমরা যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে কারণ তৈরি করি। কিন্তু উন্মাদের শূন্য করোটি বা মৃত্যুকে ছুঁয়ে থাকা মানুষটির কাছে তার কোনো অর্থ নেই। আমাদের যাবতীয় বোঝাবুঝির বাইরে তার অনুভবের নশ্বর মুহূর্তটি অমোঘ। একমাত্র সেই জানে তার ভাষা, নীরবতার ভাষা – নৈঃশব্দের প্রত্নগহ্বর। হৃদয়ের নৈঃশব্দের ভিতরে যেন এক সৃজনপ্রক্রিয়া। আফ্রিকার কোনো ভাস্কর্যের মতো, শান্ত অথচ কী ভয়ঙ্কর।"[৪২]

খুব সঙ্গতভাবেই হয়তো আলোচ্য আখ্যানের বয়ানে এসে পড়ে ম্যাক্সিম গর্কি এবং জীবনানন্দ দাশের মধ্যে কাল্পনিক তর্ক।[৪৩] জীবনানন্দ, যাঁকে আমরা মৃত্যুচেতনার কবি বলে দেগে দিই তাঁরই মুখ দিয়ে এই আখ্যানের আখ্যানকার বলেন: "সমাজ কখনও আত্মহত্যা করায় না। সে বেঁচে থাকার কথাই বলে, আর সেজন্য সমঝোতা করতে বলে। কেউ কেউ সমঝোতা করে না। তারা ভবঘুরে হয়ে যায়, কেউ পাগল, কেউ বা আত্মহত্যা করে।"[৪৪] অর্থাৎ তিনিও শেষ অব্দি লড়াইয়ের কথাই বলেন। সেই লড়াই লড়তে লড়তেই বিপ্লবী হতে চাওয়া রজত হয়ে ওঠে সামাজিক। "সংসারের অন্ধ বৃত্তে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছিল, যে সংসার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জানার ইচ্ছেকে মেরে ফেলে। বলা যায়, রজত সামাজিক হয়ে উঠেছিল।"[৪৫] এখানেই রজত আর জীবনানন্দের মাল্যবান (বলা ভালো জীবনানন্দ) একাকার হয়ে যায়: "আজ বিশে অঘ্রাণ, মাল্যবান বললে, পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন; ঢের ভালো ব্যবহার হতে তো পারে জীবনের; তা হয়েছে? হয়নি? হবে? বোঝা কঠিন; মাঝে মাঝে তুচ্ছ বেনে-বৌ পাখির চেয়েও বেশি বেনেতি বলে মনে হয় সব; খাচ্ছি দাচ্ছি সংসারের বেনেগিরি করছি।" বেনেগিরি করতে চায়নি, পারেনি বলেই এযুগের নবকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের মতো, কিন্তু অন্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কালিক দ্বন্দ্বের এই ভয়াবহ বার্তা আপাতভাবে 'উন্মাদের পাঠক্রম' মনে হলেও লড়াইয়ের ময়দানে যারা আছে তারা বুঝে নিতে পারে এই উপন্যাস বা না উপন্যাসের মরমবাণী। আলোর সন্ধান যে সোজা নয়, তন্ত্রমন্ত্রে আন্দোলিত জীবন যে কী ভয়ংকর সবকিছুই এযুগের নবকুমারেরা হাড়েহাড়ে টের পায়। সেই সাপেক্ষে আলোচ্য আখ্যানের পাঠযোগ্যতা আরও বিস্তৃত হওয়ার অবকাশ রাখে।

**তথ্যসূত্র:**

১। বল রবিশংকর, মধ্যরাত্রির জীবনী, কোরক, কলকাতা-৫৯, দ্বিতীয় সং জানুয়ারি ২০০৫, পৃ.১৪
২। তদেব, পৃ.৭
৩। তদেব, পৃ.৮
৪। তদেব, পৃ.১৩
৫। তদেব, পৃ.৪৭
৬। তদেব, পৃ.৫১
৭। তদেব, পৃ.১৫
৮। তদেব, পৃ.১৫
৯। তদেব, পৃ.১৯
১০। তদেব, পৃ.৫৫
১১। তদেব, পৃ.৪১
১২। তদেব, পৃ.৪৩
১৩। তদেব, পৃ.২১
১৪। তদেব, পৃ.৪৩
১৫। তদেব, পৃ.৭৪
১৬। তদেব, পৃ.৭৪
১৭। তদেব, পৃ.৭৯
১৮। তদেব, পৃ.৬৩
১৯। তদেব, পৃ.৯
২০। তদেব, পৃ.১০
২১। তদেব, পৃ.২৮
২২। তদেব, পৃ.২৭
২৩। তদেব, পৃ.৩৮
২৪।তদেব, পৃ.১১
২৫। তদেব, পৃ.১৩
২৬। তদেব, পৃ.১৭
২৭। তদেব, পৃ.২৫
২৮। তদেব, পৃ.২৭
২৯। তদেব, পৃ.২৯
৩০। তদেব, পৃ.৫২
৩১। তদেব, পৃ.৭১
৩২। তদেব, পৃ.৭৬
৩৩-৩৫। তদেব, পৃ.৬১
৩৬। তদেব, পৃ.৩৮
৩৭। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী' (লন্ডন, ১৯ অক্টোবর, ১৮৯০। ২৫/৬/১২৯৭) থেকে উদ্ধৃতি

৩৮। বল রবিশংকর, মধ্যরাত্রির জীবনী, কোরক, কলকাতা-৫৯, দ্বিতীয় সং জানুয়ারি ২০০৫, পৃ.৫৯

৩৯-৪০। তদেব, পৃ.৬৪

৪১। তদেব, পৃ.৬৮

৪২। তদেব, পৃ.৭৭

৪৩। তদেব, পৃ.৭৮-৭৯

৪৪। তদেব, পৃ.৭৯

৪৫। তদেব, পৃ.৮৪